লাইব্রেরি কেন দরকার

ইমাম গাজ্জালী

ভাত খেলে পেটের ক্ষুধা মেটে বটে, কিন্তু শরীরের পুষ্টির চাহিদা মেটে না। এজন্য দরকার মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, মাখন, ডাল, ফলমুল আর শাকসবজি। তদ্রুপ, পাঠ্যবইয়ের পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা যায়, চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বড় বড় কর্মকর্তা হওয়া যায়, ক্যারিয়ার গড়া যায়, দশজনের কাছে বুক ফুলিয়ে নিজের 'সাফল্য' তুলে ধরা যায়, কিন্তু সমাজটি যে ঘোর অমানিশায় ডুবে আছে, সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা যায় না। ওই ক্যারিয়ারিস্টদের দিয়ে অন্ধকার অমানিশায় আলো ফেলা যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে, ক্যারিয়ার গড়ার জন্য দরকার পাঠ্যবই মুখস্থ করা, 'ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট' হওয়া। এজন্য দরকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনো। বইয়ের মৃত অক্ষরগুলো মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় বমি করে দিতে পারলেই হল, ব্যাস।

আর সমাজ যে-অন্ধকারে তলিয়ে আছে, সেখান থেকে তাকে মুক্ত করতে দরকার আলোকিত মানুষ। দরকার জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ; রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ দরকার সর্বব্যাপী জাগরণ। দরকার মানুষের ভেতরের মানুষকে জাগিয়ে তোলার আয়োজন। এজন্য লাইব্রেরি ছাড়া আর কোনো কিছু সহায় হতে পারে না। তবে তার আগে দরকার, সমাজটি যে অন্ধকারে তলিয়ে আছে, সেটা উপলব্ধি করা ও স্বীকার করে নেওয়া।

আমাদের শাসনব্যবস্থা এখনও বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা নিয়ে টিকে আছে। আমরা যদি সেই দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি, যে-শিক্ষা ঔপনিবেশিক যুগে মানুষ তৈরির বদলে কেবল কেরানি তৈরি করত, আর এখন সুবিধাবাদী সমাজের শ্রমশোষণের উপাদান মাত্র! তাহলে কি আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াব? ত্রিশ লাখ শহীদের কথা ভুলে গিয়ে, রফিক-শফিক-জব্বারের কথা ভুলে গিয়ে, সুর্যসেন-ক্ষুদিরামের কথা ভুলে গিয়ে আমরা কি বলব–আমাদের কোনো লাইব্রেরির প্রয়োজন নেই?

সম্পদ দুই ধরনের, একটা ভাবগত সম্পদ, আরেকটা বস্তুগত সম্পদ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা, নন্দনতত্ত্ব–এসব হলো ভাবগত সম্পদ। আর নগদ অর্থ, খনিজ সম্পদ, ভোগ্যপণ্য, শিল্পকারখানা হলো বস্তুগত সম্পদ। যে-সমাজে ভাবগত সম্পদের অভাব, তারা কেবল ধ্বংস আর যুদ্ধই ভালোবাসে। অপরদিকে যারা ভাবগত সম্পদে সমৃদ্ধ, তাদের কাছে বস্তুগত সম্পদ নিজে এসেই ধরা দেয়। ভাবগত সম্পদ অর্জন করতে পেরেছে বলে বস্তুগত সম্পদেও সমৃদ্ধ হতে পেরেছে ইউরোপ, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপের সমাজ। তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, পুরোনো কুসংস্কার আর ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা। নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে আধুনিক মন-মনন-মনীষা।

পেটের ক্ষুধা যাদের চিত্তকে কাবু করতে পারে নি, ক্ষুধা নিয়েও তারা ক্ষুধাকে অতিক্রম করতে শিখেছে, লাইব্রেরি তাদের কাছে খুবই মূল্যবান, এ কারণে খাদ্য ও সম্পদ এখন তাদের পিছু পিছু ছোটে। তাদের জীবনের ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। পাকস্থলীতে আটকে নেই জীবনের মানে। একটা জাতি জ্ঞানের সাধনার ভেতর দিয়েই সেটা অর্জন করতে পারে। এ-কারণে পশ্চিমের মানুষ লাইব্রেরির কদর বোঝে, শত সীমার মধ্যেও লড়াই করতে জানে। আমাদের এখানেও তেমন আয়োজন ষাটের দশকে অনুরণিত হয়েছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের সেই আয়োজন এখন দিকভ্রান্ত। চাইলে সেই ভ্রান্তির কারণ অনুসন্ধান করে সেখান থেকেও নবতর যাত্রা শুরু করা যেতে পারে।

ষাটের দশক ছিল বাংলাদেশের উত্থানপর্ব, যে-সময়টা ছিল বাঙালির রাষ্ট্র সাধনার কাল, আত্মপরিচয়ের সন্ধানকাল। যার ফলশ্রুতি স্বাধীনতা। তা কি এমনি এমনি হয়েছে? সেসময়ে গ্রামেগঞ্জে, পাড়ামহল্লার তরুণদের মধ্যে ক্লাব গড়ে তোলার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। সেইসঙ্গে লাইব্রেরি। তখন প্রতিটি ক্লাব ঘিরে গড়ে উঠত লাইব্রেরি। পাশাপাশি গ্রামের রাস্তা নির্মাণ, খালের ওপর সাঁকো তৈরি, গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সহায়তাদান, নাটক-থিয়েটার মঞ্চস্থ করা, একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন, এসব কাজে ঝুঁকেছিল তরুণেরা।

একই চিত্র দেখা গেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কালেও। সেসময়ে প্রতিটি ক্লাবকে ঘিরে, লাইব্রেরির পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ব্যায়ামাগার। তারা জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চার দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই সময়ে যত ভালো ভালো উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশ হতো, সবগুলোই পড়ে ফেলার একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হতো তরুণদের মধ্যে। সেটাও ছিল আরেক স্বপ্ন-জাগানিয়া কাল।

এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আসলে আমরা কী চাই। তার ওপরই নির্ভর করবে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা। এই মুহূর্তে সমাজের জন্য বেশি দরকারি কারা? ক্ষমতাভোগী ও সুবিধাভোগীর দল নাকি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ? নাকি সমাজের নানা কোণে জমে থাকা অন্ধকারে আলো ফেলতে পারে–এমন ব্যক্তিত্ব। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সাহসী মানুষ, নাকি স্বার্থলোভি ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ–আমরা কোনটা বেছে নেব, তার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা।

বইয়ের কদর কমে যাওয়ার মধ্যেই বোঝা যায়, আমরা একটা স্বপ্নহীন, প্রশ্নহীন মানসিক আকাল অতিক্রম করছি। যে-অন্ধকার জমে আছে হাজার বছর ধরে, যে-অন্ধকার টিকে আছে মানুষের কুসংস্কারে আর ক্ষমতার প্রতিক্রিয়ায়; যে-অন্ধকার দূর করতে রেনেসাঁস ঘটিয়েছিল পশ্চিম, এখানে তাকে দূর করার কোনো কার্যকর আয়োজন এখনও অনুপস্থিত।

আমরা যদি সমাজের এই অন্ধকার দূর করতে চাই, সর্বব্যাপী জাগরণকে ধারণ করতে চাই,

তাহলে দরকার লাইব্রেরি। শরণ নিতে হবে বইয়ের। যার যেখানে যতটুকু সুযোগ রয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়েই শুরু করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে লাইব্রেরি গড়ার আন্দোলন।

সেই লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাব:

১. লাইব্রেরি, বিশেষত ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে। ঈদ-পূজাসহ যাবতীয় ছুটির দিনেও লাইব্রেরি বন্ধ হবে না;

২. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতেও একই পদ্ধতি চালু করতে হবে;

৩. পাঠকদের থাকার জন্য লাইব্রেরিতে ডর্মিটরির ব্যবস্থা করতে হবে, সেখানে স্বল্পমূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে;

৪. প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনে বইয়ের স্টল রাখতে হবে, সামান্য টাকা দিয়ে যাতে যাত্রাকালে বই ধার নিয়ে পড়ার সুযোগ পায় রেলযাত্রীরা; একইভাবে প্রতিটি রেল-স্টেশনে এবং বাস-স্টপেজে বইয়ের স্টল বা স্ট্রিট লাইব্রেরি তৈরি করতে হবে;

৫. প্রতিটি পাড়ামহল্লায়, গ্রামেগঞ্জে ব্যক্তির লাইব্রেরির উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে, গ্রামে ও শহরে লাইব্রেরি-আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে।